দ্বিতীয় সেমিস্টার (সাম্মানিক) (২০২০ জানুয়ারি-জুন)

অরিন্দম মন্ডল

বাংলা বিভাগ

বিভাগ-গ, ক্রমিক সংখ্যা-১৮

রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৫–১১১২–০০০৫–১৯

রোল নং- ১৯২১১৫–২১–০০০১

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

পরামর্শ ও সহায়তা :

অধ্যাপিকা সুমিতা সাহা,

বিভাগীয় প্রধান,

বাংলা বিভাগ

বিষয়

- **উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের বিবর্তন:সূচনাপর্ব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র(১৮০০-১৮৯৪ খ্রী:) :**

1. শ্রীরামপুর মিশন
2. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
3. রাজা রামমোহন রায়
4. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
5. অক্ষয়কুমার দত্ত
6. প্যারীচাঁদ মিত্র
7. কালীপ্রসন্ন সিংহ
8. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর মিশন

শ্রীরামপুর মিশন (১৮০০-১৮৪৫) ভারতের প্রথম নিজস্ব প্রচারক সংঘ। ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি উইলিয়ম কেরী ও ভ্রাতৃবৃন্দ এ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন হুগলি জেলার দুটি স্থান থেকে বাংলায় যীশুর বাণী প্রচার শুরু করে। এই জেলার ব্যান্ডেলে প্রথম ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৫৯৯)। এর দুশ বছর পর (১৮০০) শ্রীরামপুরে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ গড়ে ওঠে। এই চার্চ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়ম কেরী (১৭ আগস্ট, ১৭৬১)। তাঁরই উদ্যমে ১৭৯২ সালে ‘ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি’ গঠিত হয়। কেরী ও টমাস এই সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে ১৭৯৩ সালে বাংলায় আসেন খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে। প্রথম কয়েকমাসে কিছু সংকট মোকাবিলার পর কেরী উত্তরবঙ্গের মদনাবতীতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বাইবেল অনুবাদ, বিদ্যালয় স্থাপন, ধর্ম প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে মিশনের কাজ শুরু করেন। এখানে প্রথম খ্রিস্ট মন্ডলী গঠিত হয়। আঠারো শতকের শেষের দিকে কেরীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আরও কয়েকজন মিশনারিকে বাংলায় পাঠানো হয়। তাঁরা ইংরেজ সরকারের মিশনারি বিতাড়ন এড়াবার জন্য ডেনিশদের শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন। এখানে কেরী অর্থ তহবিলের ভার নেন এবং বাইবেল অনুবাদের কাজ পরিচালনা করেন। মার্শম্যান বিদ্যালয় এবং ওয়ার্ড মুদ্রণ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ফাউন্টেনের ওপর ভার পড়ে গ্রন্থাগার গড়ার। ১৮০০ সালের ২৪ এপ্রিল শ্রীরামপুর মিশন চার্চের উদ্বোধন হয়। কেরী হন চার্চের পুরোহিত এবং মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সহকারী পুরোহিতের ভার নেন। এই মিশন ছিল স্বনির্ভরশীল। মার্শম্যান বিদ্যালয়, ওয়ার্ড প্রেস এবং কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করে নিজেদের ভরণপোষণ ও মিশনের কাজ চালাতেন।

◆ শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ –

1.উইলিয়াম কেরির সেন্ট ম্যাথুজ গসপেলের বাংলা অনুবাদ "মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত" (১৮০০)।

2.সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুবাদ : ব্যোপদেবের "মুগ্ধবোধ", উইলিয়াম কেরীর "Sanskrit Grammar", কোলব্রুক সম্পাদিত "অমরকোষ" ইত্যাদি।

3.রামরাম বসুর সহযোগিতায় উইলিয়াম কেরীর অনূদিত বাইবেল "ধর্মপুস্তক" (১৮০১) নামে প্রকাশিত হয়।

4.সমগ্র বাইবেল "ধর্মপুস্তক" (১৮০৮) নামে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

5.কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের "মহাভারত" মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

6.শ্রীরামপুর মিশন থেকে জন মার্শম্যান সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র "দিগদর্শন" এবং "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।

7.জন মার্শম্যানের ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষায় লেখা দু'খণ্ডের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৮৩১), "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৪৮) প্রভৃতি।

দেশীয়দের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালে মিশনের পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষাদানও এই কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ফলে এই কলেজে দুই ধারার শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৮২২-২৩ সালে উইলিয়ম ওয়ার্ড ও কেরীর বড় ছেলে ফেলিক্সের হঠাৎ মৃত্যু হলে মিশন দারুণ সংকটে পড়ে। হুগলি নদীর বন্যায়ও মিশন খুব বিপাকে পড়ে। ডেনিশ সরকারের আনুকূল্যে শ্রীরামপুর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু মিশনের বিপর্যয় এ সময় চরমে ওঠে। ১৮২৯-এ শ্রীরামপুর মিশন বাধ্য হয় ইংল্যান্ডের সোসাইটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে।এই মিশন তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন মিশনারি সোসাইটিতে পরিণত হয়। কিন্তু এ সময় কলকাতার যে কোম্পানিতে মিশনের টাকা গচ্ছিত ছিল তা দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে মিশনের জন্য তা অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনে। মিশনের এই দুরবস্থাকালে কেরী (১৮৩৪) এবং মার্শম্যান (১৮৩৭) এর মৃত্যু হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে কয়েক বছর চলার পর ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুর মিশন বন্ধ হয়ে যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর লক্ষ্য করলেন যে, বিলেত থেকে যেসব সিভিলিয়ান কর্মচারী এদেশে আসে, তারা এদেশের ভাষা না জানাতে শাষন ও শোষনে বিঘ্নতা দেখা দেয়।ফলে এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৮০০ সালের ৯ জুলাই গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ও তার কাউন্সিলরদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতার লালবাজারের নিকটে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সিভিলিয়ানরা এদেশের ভাষা,সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, আইন-কানুন ইত্যাদি শিখতে পারবে।

১৮০০ সালের ১৮ই আগস্ট এ কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, উর্দু, বাংলা, মারাঠা, তেলিঙ্গা, তামিল ও কানাড়ী ভাষা নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।এসময় কলেজের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন পাদ্রি ডেভিড ব্রাউন এবং তার সহকারী হন সি.বুকানন।উক্ত কলেজে আরবি, ফারসি ও উর্দূ বিষয়ে শিক্ষা শুরু হয় ১৮০০ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে।

১৮০১ সালের ১লা মে উইলিয়াম কেরীকে প্রধান অধ্যাপক করে এবং তার অধীনে ৬ জন সহকারী নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়।উইলিয়াম কেরী ছিলেন প্রধান অধ্যাপক।এ সময়ে তার অধীনে প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং ২য় পণ্ডিত রামনাথ বানস্পতি এবং রামরাম বসু, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রাজিব লোচন মুখোপাধ্যায় সহ মোট ছয় জন সহকারী ছিল। ১৮১৮ সালের জুন মাসে এ কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা দাড়ায় ১৫ জনে।উল্লেখ্য যে, উইলিয়াম কেরী এ কলেজের বাংলা, সংস্কৃত এবং মারাঠী ভাষার প্রধান ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮৫৪ সাল পযর্ন্ত চালু থাকে।তবে রাজা রামমোহন রায় যখন থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়, তখন থেকে এই কলেজের কার্যক্রম হ্রাস পেতে থাকে।

বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অনস্বীকার্য।এ কলেজের হাত ধরেই বাংলা গদ্যের বিকাশ পর্বের যাত্রা শুরু হয়।নিচে এ কলেজের পণ্ডিতদের লেখনি গুলো তুলে ধরা হলো-

1. উইলিয়াম কেরীঃ
   i. কথোপকথন(১৮০১)
   ii. ইতিহাসমালা (১৮১২)
2 রামরাম বসুঃ কেরী সাহেব যার কাছ থেকে বাংলা শিখেছিলেন সেই রামরাম বসুর লেখা গ্রন্থ ২টি
   i. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র(১৮০১)
   ii. লিপিমালা(১৮০২)
   **তিনি কেরী সাহেবের মুন্সি হিসেবে পরিচিত।
3. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারঃ
   i. বত্রিশ সিংহাসন(১৮০২)
   ii. হিতোপদেশ(১৮০৮)
   iii. রাজাবলী(১৮০৮)
   iv. বেদান্ত চন্দ্রিকা(১৮১৭)
   v. প্রবোধচন্দ্রিকা(১৮১৩)
4. হরপ্রসাদ রায়
   i. পুরুষ পরীক্ষা(১৮০৫)

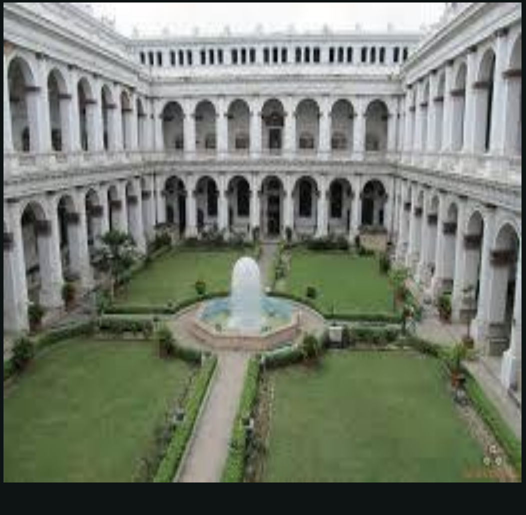

আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচিত এসকল গ্রন্থ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

রাজা রামমোহন রায়

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক আবর্তে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল এবং নানা কুসংস্কারের চাপে সমাজের স্বাভাবিক ধারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে পুনরায় যে নতুন জাগরণ সৃষ্টি হয়, তাকেই বাংলার নবজাগরণ বলা হয় । পঞ্চদশ শতাব্দিতে ইটালিতে যে নবজাগরণ হয় তা যেমন কালে কালে সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল বাংলার নবজাগরণ তেমনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করেছিল । পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও যেমন ইটালির নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত । ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে মে (মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ই আগস্ট) হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা রামমোহন রায় পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চেতনার প্রতিফলন পড়েছিল । প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির অপসারণ করে তিনি সমাজ জীবনকে কলুষ মুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন ।

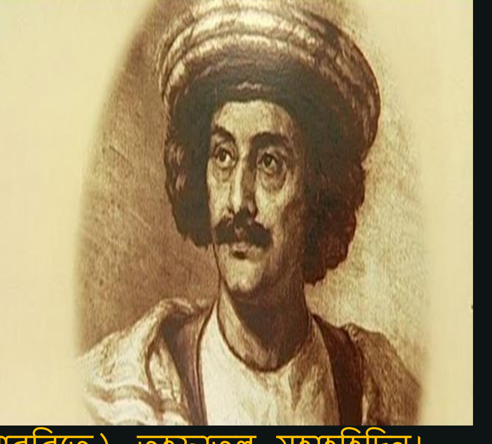

1.কর্ম–জীবন- তরুণ বয়সে তিনি কলকাতায় মহাজনের কাজ করতেন। ১৭৯৬ সালে রামমোহন অর্থোপার্জন শুরু করেন। ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। কলকাতায় প্রায়ই আসতেন এবং কোম্পানির নবাগত অসামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। এই সুযোগে ভালো করে ইংরেজি শিখে নেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে সিভিলিয়ান কর্মচারীদের মধ্যে জন ডিগবির সঙ্গে তার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতা য়। কোম্পানির কাজে ডিগবির অধীনে তিনি দেওয়ানরুপেপুরে কাজ করেন ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত।

তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লেখা (ভূমিকা অংশ আরবিতে) তুহফাতুল মুহাহহিদিন। বইটিতে একেশ্বরবাদের সমর্থন আছে। এরপর একেশ্বরবাদ (বা ব্রাহ্মবাদ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেদান্ত–সূত্র ও তার সমর্থক উপনিষদগুলি বাংলার অনুবাদ করে প্রচার করতে থাকেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাণ্ডূক্যোপনিষদ ও মুণ্ডকোপনিষদ। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হয়ে তার লেখার প্রতিবাদ দেখাতে লাগলেন। এই সব প্রতিবাদ কটূক্তিপূর্ণ এবং বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। রামমোহনও প্রতিবাদের প্রতিবাদ করলেন যুক্তি দিয়ে ও ভদ্রভাষায়। প্রতিবাদ–কর্তারা অবিলম্বে থেমে গিয়েছিলেন। প্রতিবাদ–কর্তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, এঁর গ্রন্থের নাম 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। বেদান্তচন্দ্রিকা'র প্রতিবাদে রামমোহন ভট্টাচার্যের সহিত বিচার লিখে প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বর উপাসনার পথ দেখালেন আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করে। এই আত্মীয় সভাকেই পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজ নাম ও রূপ দেন। সাহেবদের বাংলা শেখানোর জন্য তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে ব্যাকরণ রচনা করেন।

3.সতীদাহ ও রামমোহন রায়- বেদান্ত–উপনিষদগুলি বের করবার সময়ই তিনি সতীদাহ অশাস্ত্রীয় এবং নীতিবিগর্হিত প্রমাণ করে পুস্তিকা লিখলেন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। প্রতিবাদে পুস্তিকা বের হল 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহন রায়

বেদান্তচন্দ্রিকার প্রতিবাদে রামমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচার লিখে প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বর উপাসনার পথ দেখান আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করে। এই আত্মীয় সভাকেই পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন রূপ দেন।

4.শেষ জীবন-১৮৩৩ সালে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ব্রিস্টলের কাছে স্টেপলটনে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিস্টলে আর্নস ভ্যাল সমাধিস্থলে তাকে কবর দেওয়া হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি বাংলা সাহিত্যের জনক হিসাবে পরিচিত। তবে আধুনিক যুগের অনেকেই তার সম্পর্কে শুধু এ টুকুই জানেন যে তিনি বাংলায় যতি চিহ্নের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তিনি বাংলা ভাষার প্রাণদান করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা গদ্য ছিল প্রাণহীন। তখন বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ছিল অতিমাত্রায়। ফলে বাংলা সাহিত্য গুটিকয়েক পন্ডিতের চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগরই বাংলা ভাষাকে সেই বলয় থেকে বের করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন যেন তার রস আস্বাদন করতে পারে।

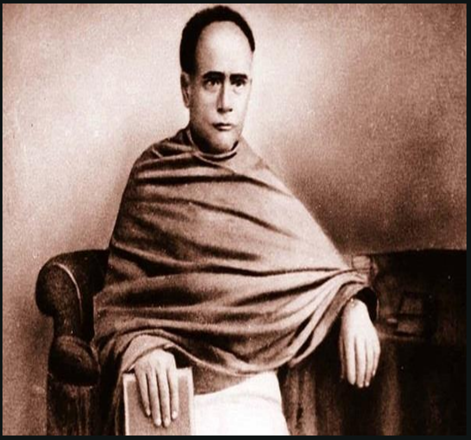

ভাষা যে শুধুমাত্র ভাব আদান প্রদানের একটি মাধ্যম নয় তার দ্বারা যে আরো বেশি কিছু করা সম্ভব তা বিদ্যাসগরই প্রথম দেখিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ম ভালভাবে পর্যবেক্ষন করলে বোঝা যাবে বক্তব্যকে সরল, সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে কিভাবে সাহিত্যের প্রকৃত স্বার্থকতা সৃষ্টি করতে হয় তা তিনি করে দেখিয়েছেন। “বেতালপঞ্চবিংশতি” বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম বাংলা বই। তবে এটি মৌলিক রচনা নয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী মর্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাগর “বৈতাল পচীসী” নামক একটি হিন্দী বই-এর অনুবাদ করেন। বাংলা সাহিত্যে তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের আর্বিভাব হয়নি। উপন্যাস ও গল্পের স্বাদ তখনো বাঙালী জাতি পয়নি। তাই “বেতালপঞ্চ-বিংশতি” শুধু ভাষার জন্য না গল্পের জন্যেও সমাদৃত। যদিও “বেতালপঞ্চবিংশতি” হিন্দী থেকে অনুবাদ করা কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ তার নিজস্বতা বজায় রেখে অনন্য দক্ষতার সাথে যা উপস্থাপন করেছেন।

মার্শম্যানের Outlines of the History of Bengal for the Use of Youths in India কে অনুবাদ করে বিদ্যাসাগর লেখেন “বাংলার ইতিহাস”। বইটিতে নবাব সিরাজদৌলার রাজত্বলাভের পর থেকে লর্ড বেন্টিং এর সময় পর্যন্ত ইতিহাস লিখিত হয়েছে। জানা যায় সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার ইচ্ছা ছিল বিদ্যাসাগরের কিন্তু শারীরিক অসুস্থ্যতার জন্য তা আর সম্পূর্ণ করতে পারেননি তিনি। বিদ্যাসগর মূলত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যগ্রন্থগুলি অনুবাদ করে বাংলাসাহিত্যর ভিত রচনা করেন তিনি। কালিদাসের “রঘুবংশ”, “কুমারসম্ভব” এবং মেঘদূত সম্পাদনার পাশাপাশি “শকুন্তলা”র অনুবাদও করেন তিনি। তৎকালীন সময়ে “শকুন্তলা”র জনপ্রিয়তা থেকে আন্দাজ করা যায় তার অবদান। সংস্কৃত ভাষা’র এই পন্ডিত ইংরেজি ভাষায়ও সমান দক্ষ ছিলেন। শেক্সপীয়রের “The comedy of Errors” এর অনুবাদ “ভ্রান্তিবিলাস” রচনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের হাস্যরস প্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর যে শুধু মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যচর্চা করেছিলেন তা নয়। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য তার কলম ছিল সক্রিয়। “বাল্যবিবাহের দোষ” নামে একটি প্রবন্ধ সেই সময় কঠোর সমাজ ব্যবস্থাকেও নাড়া দিয়েছিল। বিধবা বিবাহের পক্ষে তার প্রবন্ধ ছিল “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব”। এই বইয়ে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সকল যুক্তিতর্কের পাল্টা জবাবের অবতারণা করেন। বইটি মুলত তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে। তিনি সমাজের জন্য কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায় তার এ উক্তি থেকে, “বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।” উক্তিটি থেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তারও পরিচয় মেলে। বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের আইন পাশ হয়। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই পরলোক গমন করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার দত্ত(১৮২০-১৮৮৬) শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্মীপুরুষ। জন্ম ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই নবদ্বীপের পাঁচ মাইল উত্তরে, চুপী গ্রামে। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত ছিলেন কলকাতার কুঁতঘাটের পুলিশ-কার্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ; পরে সাবইন্সপেক্টর হন। মাতা, দয়াময়ী দেবী।

1.কর্মজীবন:-অক্ষয়কুমার সংবাদপত্রে লেখালেখির মাধ্যমে লেখক জীবন শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন; তিনি মূলত ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলি বাংলায় অনুবাদ করতেন। ১৮৩৯ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য মনোনীত হন এবং কিছুদিন সভার সহ-সম্পাদকও ছিলেন। ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪২ সালে তিনি নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যাদর্শন নামের একটি মাসিক পত্রিকা চালু করেন। কিন্তু এই পত্রিকা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভের কারণে ১৮৪৩ সালে তাকে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে মনোনীত করা হয়। তিনি ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। প্রবন্ধগুলিতে সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের নির্ভীক মতামত (জমিদারি প্রথা, নীলচাষ, ইত্যাদি সম্পর্কিত মতামত) প্রকাশ পেত। এই সব প্রবন্ধ তিনি পরে বই হিসাবে বার করতেন। তার প্রথম বই ভূগোল (১৮৪১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পড়াশোনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল । দীর্ঘদিন পরে তার দ্বিতীয় বই বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১ম ভাগ ১৮৫২ সালে বের হয়। এরপর এই বইয়ের ২য় ভাগ, চারুপাঠ (তিনভাগ), ধর্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (দুই ভাগ), ইত্যাদি বই প্রকাশিত হয় । চারুপাঠ শিশুপাঠ্য বই হিসেবে একসময় জনপ্রিয় ছিল।

অক্ষয়কুমারের অণুপ্রেরণার উৎস ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও ১৯জন বন্ধুর সাথে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন; এরাই ছিলেন প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন তত্ত্ববোধিনী সভায় তিনি সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। ব্রাহ্ম চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হিন্দু হলেও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রাধান্য মেনে নেয়ার মানসিকতা তার মধ্যে ছিল। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারণে হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ-এ বর্ণিত আত্মা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বহু ব্রাহ্ম ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রভাবিত হয় তার সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলনে শরিক হন। ধর্ম এবং দর্শনের পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের বেড়াজালে পড়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়েছিলেন। এ কারণে পরবর্তীতে ব্রাহ্ম সমাজ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-ও পরিত্যাগ করেন।

2.অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:-

ক) প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার

খ) ভূগোল (১৮৪১)

গ) বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫২; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩)

ঘ) চারুপাঠ (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ- ১৮৫৪, ৩য় খণ্ড- ১৮৫৯)

ঙ)ধর্মনীতি (১৮৫৫)

চ)পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)

ছ)ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ- ১৮৭০, ২য় ভাগ-

3.মৃত্যু:-

বালিগ্রামে 'বোটানিক গার্ডেন' নামের বাড়িতে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৮৬ সালের ১৮ মে মারা যান।

প্যারীচাঁদ মিত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র (২২শে জুলাই, ১৮১৪– ২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৩) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক; ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর।

1.জন্ম

প্যারীচাঁদ মিত্র কলকাতায় ১৮১৪ সালের ২২শে জুলাই এক বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। তিনি কাগজ ও হুন্ডি ব্যবসায়ী ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

2.শিক্ষাজীবন

শৈশবে একজন গুরুমহাশয়ের নিকট বাংলা, পরে একজন মুন্সির নিকট ফারসি শিখেন। ইংরেজি লাভের জন্য হিন্দু কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। ঐ সময় ডিরোজিও নামে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন হিন্দু কলেজে। তিনি তার শিষ্য ও ভাবশিষ্য ছিলেন।[১]

3.কর্মজীবন -তিনি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। তিনি ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি ভালো জানতেন। বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মহিলাদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার সহযোগী ছিলো রাধানাথ শিকদার। তিনি এছাড়াও জনকল্যাণ মূলক কাজও করতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি পশু-ক্লেশ নিবারণী সভারও সদস্য ছিলেন। বেথুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। জ্ঞানান্বেষণ সভার সদস্য হন তিনি ১৮৩৮ সালে। তার ইংরেজি ভাষায় রচিত লেখাসমূহ ছাপা হত ইংলিশম্যান, ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ক্যালকাটা রিভিউ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকায়। তিনি পুলিশি অত্যাচারিতার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সক্রিয়তার পরিচয় দেন। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন। তিনি বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন। তিনি আমদানি ও রপ্তানি এবং চালের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।[১]

4.সাহিত্য সম্পাদনা

আলালের ঘরের দুলাল (তার শ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস)। ১৮৫৭ খ্রি. প্রকাশিত এই উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র ঠকচাচা । উল্লেখ্য যে এখানে তিনি যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা আলালী ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়েছিল The spoiled child নামে।

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯) তার এ গ্রন্থে উদ্ভট কল্পনা লক্ষ করা যায়।

অভেদী(১৮৭১)

আধ্যাত্মিকা(১৮৮০)

The Zemindar and Ryots. এই গ্রন্থটি তখনকার সময়ে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। কারণ এটি রচিত হয়েছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

যৎকিঞ্চিৎ

রামারঞ্জিকা

বামাতোষিণী

গীতাঙ্কুর[১]

5.মৃত্যু

১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর তিনি কলকাতায় মারা যান।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ – ২৪ জুলাই ১৮৭০) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক ও সমাজসেবক। বাংলা সাহিত্যে তার দুই অমর অবদানসমূহের জন্য চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন। সেগুলো হল, বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতের বাংলা অনুবাদ এবং তার বই হুতোম প্যাঁচার নকশা। তিনি ঊনবিংশ শতকের একজন বাংলা-সাহিত্য আন্দোলনে অন্যতম একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাত্র উনত্রিশ বছরের জীবনে তিনি সাহিত্য ও সমাজের উন্নয়নের জন্য অসংখ্য কাজ করেছেন।

খুব অল্প বয়সেই বহুগুণে গুণান্বিত কালীপ্রসন্নের বুদ্ধিমত্তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। এখানে সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে মিলিত হয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করতেন। উক্ত সভা বিধবাবিবাহ এবং অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের মতবাদ প্রচার করত।

সমসাময়িকদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন শিল্পসংস্কৃতির একজন মহান পৃষ্ঠপোষক, বিধবাবিবাহের একনিষ্ঠ প্রবক্তা, অনন্যসাধারণ সমাজনীতিবিদ ও দেশপ্রেমিক সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, নকশা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ মিলে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা নয়। ইংরেজিতে দি ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাক্ট-ও (১৮৬৬) তাঁর রচনা। প্রজন্ম পরম্পরায় তিনি তাঁর অসাধারণ সাহিত্যকর্ম হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২) এবং পুরাণসংগ্রহ (মহাভারত থেকে পৌরাণিক গল্পের সংগ্রহ, ১৮৬০-১৮৬৬)-এর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

হুতোম প্যাঁচার নকশা তাঁর শ্রেষ্ঠ মৌলিক রচনা।তিনি এই বইয়ে হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে এক রসাত্মক পদ্ধতিতে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছিলেন। এতে কলকাতার সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং কলকাতার কথ্য ভাষাকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলা গদ্যের উন্নয়নে হুতোম প্যাঁচার নকশা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। তৎকালীন কলকাতার আচার ব্যবহার, পালা-পার্বণ, সভা-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক উৎসব এবং নানা ঘটনা হুতোম প্যাঁচার নকশায় সরসভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হুতোম প্যাঁচার নকশা ছিল কথ্য ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা বই।

সতেরো খন্ডে সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা গদ্যানুবাদও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এটি বাংলা সাহিত্যেরও একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিম্নলিখিত বইগুলি লিখেছিলেন:

1.বাবুনাটক (১৮৫৪)
2.বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭)
3.সাবিত্রী-সত্যবান নাটক (১৮৫৮)
4.মালতী-মাধব নাটক (১৮৫৯)
5.হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনো বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন
6.হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬১)
7.পুরাণ সংগ্রহ বা কালীসিংহের মহাভারত (মহাভারত অনুবাদ, ১৮৫৮-৬৬)
8.বঙ্গেশ বিজয় (১৮৬৮)
9.শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (১৯০২)

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কালীপ্রসন্ন মাত্র ত্রিশ বছরের জীবনে তাঁর এ সকল কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৮৭০ সালের ২৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন ১৮৩৮ – ৮ এপ্রিল ১৮৯৪) ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক। বাংলা উপন্যাসের ও **প্রবন্ধের** বিকাশে তার অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাকে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে, সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছদ্মনাম হিসেবে কমলাকান্ত নামটি বেছে নিয়েছিলেন। তাকে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য সম্রাট বলা হয়।

প্রবন্ধ:

1. কমলাকান্তের দপ্তর
2. বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫)
3. বিবিধ সমালোচন (১৮৭৬)
4. প্রবন্ধ পুস্তক
5. বিবিধ
6. বিবিধ প্রবন্ধ— প্রথম ভাগ (১৮৮৭)
7. বিবিধ প্রবন্ধ— দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)
8. সাম্য (১৮৭৯)
9. বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (নবম ভাগ) (১৮৮০)
10. কৃষ্ণচরিত্র (১৮৯২)
11. ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮)
12. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১৯০২)
13. দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
14. লোকরহস্য (১৮৭৪)

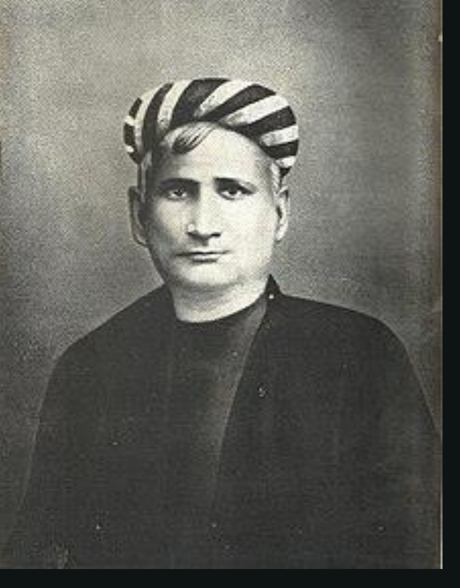

কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি ব্যক্তিধর্মী প্রবন্ধ-সংকলন। বইটির প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, প্রথম ভাগ নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে (১২৯২ বঙ্গাব্দ) "কমলাকান্তের দপ্তর" (মোট ১৪টি প্রবন্ধ, তন্মধ্যে ১১টি বঙ্কিমচন্দ্রের), "কমলাকান্তের পত্র" (পাঁচটি প্রবন্ধ) ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" – এই তিনটি অংশ একত্রে কমলাকান্ত নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ষোল এই গ্রন্থে আফিঙখোর ব্রাহ্মণ কমলাকান্তের জবানিতে লেখক তথ্য ও যুক্তিবিনির্ভর সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করা হয়।

শেষ জীবনে তার স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তার বহুমূত্র রোগ বেশ বেড়ে যায়। এই রোগেই অবশেষে তার মৃত্যু হয়, এপ্রিল ৮, ১৮৯৪ (বাংলা ২৬ চৈত্র ১৩০০ সাল)।

ধন্যবাদ